স্বপ্ন ছুঁয়ে যাই

Canada

স্বপ্ন ছুঁয়ে যাই

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পরিকল্পনা, অনুলিখন, সংকলন ও সম্পাদনা

শাহানা হুদা
সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন (মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত)
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কামরুজ্জাহান ফ্লোরা
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
উইমেন'স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ - বাংলাদেশ প্রকল্প
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মহুয়া লেয়া ফলিয়া
সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
উইমেন'স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ - বাংলাদেশ প্রকল্প
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কৃতজ্ঞতায়

আঁখি আক্তার
মুক্তি মহিলা সমিতি, রাজবাড়ী

সাফিয়া আরেফিন
সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক, ঢাকা
ও যৌনকর্মীদের সন্তান

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-৬২১৪-২

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

অলংকরণ ও মুদ্রণ

অর্ক

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুই দশকের পথচলায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করছে। মানুষের অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন, প্রণয়ন, সংস্কারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং, ক্যাম্পেইন, দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা, কর্মসূচি প্রণয়নসহ বিভিন্ন কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। উদ্দিষ্ট জনগণের মধ্যে সব সময় অগ্রাধিকারে থেকেছে নারী ও শিশু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার, ভূমিহীন, দলিত-হরিজন ও যৌনকর্মী। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাই মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)- এর প্রধান লক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে।

যৌনকর্মীদের অধিকার বিষয়টি বাংলাদেশে এখনো অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে যেটা নিয়ে সমাজকর্মী, নারীবাদী, মানবাধিকার কর্মীদের মাঝে বহুমাত্রিক বিতর্ক আছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে রক্ষণশীল সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বহু শতাব্দী যাবৎ সহাবস্থান করছে। অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও যৌনপেশা (বাংলাদেশের সংবিধানে পতিতাবৃত্তি বলা আছে) বিষয়ে একটা দ্বিধাগ্রস্ততা আছে। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া আছে, তবে যৌনকর্মীরা এখানে এখনো অধিকতর প্রান্তিক অবস্থায় বসবাস করে, বলা যায় সমাজের প্রান্তসীমার বাইরে তাদের অবস্থিতি এবং দেশের অপরাপর নাগরিকের মতো অধিকার ভোগ করতে পারে না।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সাথে মিল রেখে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানের ভিত্তিতে এটা বলা যায়, যৌনকর্মীরা নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, শ্রমের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমজেএফ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বৈষম্য নিরসন ও তাদের অধিকার সুরক্ষায় জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পার্টনারশিপের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বাংলাদেশে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা ও চর্চাকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এমজেএফ বাংলাদেশে উইমেন'স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ – বাংলাদেশ নামে এইটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো স্থানীয় নারী অধিকার সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের দক্ষ করে তোলা, যেন তারা মাঠপর্যায়ে নারী ও মেয়েশিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও ক্ষমতায়িত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে সক্ষম হয়।

প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন যৌনকর্মী অধিকার সংগঠন ও নারী অধিকার সংগঠনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সেখান থেকে সংগৃহীত জীবনের কথা ও ঘটনার আলোকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এই প্রকাশনা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকাশনাটিতে বিভিন্ন যৌনকর্মীর সন্তান ও তাদের মায়েরা গল্পে গল্পে তুলে ধরেছেন তাদের সমস্যা, সংকট, প্রতিবন্ধকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও রাষ্ট্র-সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার চরম বেদনা। কোনো কোনো গল্প এতটাই হৃদয়বিদারক ও আবেগনির্ভর যে তা যেকোনো মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেবে, আবেগাপ্লুত করবে।

যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত এই প্রকাশনায় বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের ও তাদের সন্তানদের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্ভাব্য উদ্যোগ ও পদক্ষেপ বিষয়ে মতামত উঠে এসেছে। আশা করি, প্রকাশনাটি বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের প্রতি সাধারণ মানুষের, নীতিনির্ধারকদের এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।

এই প্রকাশনা প্রণয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যাদের কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা এই কঠিন কাজকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করেছে, তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সূচি

বাংলাদেশে যৌনকর্মীদের চিত্র

(এমজেএফ'র গবেষণার সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ)

অনুবাদঃ **শাহানা হুদা**

বাংলাদেশের যৌনকর্মীরা নানা ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার এবং একজন মানুষ হিসেবে যতটুকু মর্যাদা পাওয়া দরকার, এর ন্যূনতমও তারা পান না। এরা শুধু অধিকারবঞ্চিতই নয়, নিপীড়ন ও নির্যাতনেরও শিকার।

শুধু পেশার কারণে প্রান্তিক এই মানুষগুলো সামাজিক স্টিগমা নিয়ে খুব নিম্নতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। সাথে রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ। এই পেশাকে যেহেতু মনে করা হয় নোংরা, অসামাজিক; তাই তাদের পক্ষে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ চাওয়াটাও অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌনকর্মীদের সাথে কথা বলার সময়ও অত্যন্ত খারাপ ভাষা ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া আরো আছে নিজেদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদআতঙ্ক। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার কান্দুপট্টির সবচেয়ে পুরানো ও বড় যৌনপল্লি –টানবাজার, মাগুরা, মাদারীপুর, খুলনা এবং টাঙ্গাইলের যৌনপল্লি উচ্ছেদের স্মৃতি তারা বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে, জিনিসপত্র ও টাকাপয়সা লুট করে পথে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নিজেদের এলাকা থেকে হঠাৎ করে উচ্ছেদ হওয়া মানে তাদের আয়ের ওপর সরাসরি আঘাত। তাদের গচ্ছিত টাকাপয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাদের নিয়ে পথে বসতে হয়। সাথে মানসিক ট্রমা তো আছেই। তাছাড়া কোনোরকম বিকল্প আবাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হয় না। তখন তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যৌন ব্যবসা করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশের যৌনকর্মীরা খুব মানবেতরভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা না থাকার কারণে সরকারি সেবা সংস্থাগুলো, পুলিশ, নীতি-নির্ধারক ও রাজনীতিকেরা যৌনকর্মীদের চাহিদা, ইস্যু ও অধিকার বিষয়ে একদম উদাসীন। বরং তাদেরকে অচ্ছুত বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন মহল থেকে এই নেতিবাচক আচরণের কারণেই যৌনকর্মীরা নিয়মিত নানা ধরনের হুমকির মুখে থাকেন।

যৌনকর্মীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকলেও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো ঐক্যবদ্ধ নন। যৌনকর্মীদের জীবনের অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তাদের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে আইনি

সহায়তা না পাওয়া। কারণ, এই ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য, নীতি ও আইন না থাকায়, নাগরিক সমাজ ও এনজিও যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য খুব বেশি কিছু করতে পারে না।

যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না

দ্রুত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান ভোগবাদিতার কারণে বাংলাদেশের মতো একটি দেশেও যৌনকর্মীদের চাহিদা ও সংখ্যা বাড়ছে। নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় প্রচার-প্রচারণা এই পেশার বৃদ্ধি ঠেকাতে পারছে না। আমরা চাই যেহেতু দেশে যৌনকর্মী আছেন, কাজেই তাদের অধিকার রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি আইনি কাঠামো দরকার, যা ব্যবহার করে যৌনকর্মীরা তাদের মানবাধিকার রক্ষা করতে পারেন।

এছাড়া সরকার, এনজিও, বেসরকারি সংস্থা, কর্পোরেট সংস্থাগুলোর উচিত যৌনপল্লির বাইরে তাদের জন্য বিকল্প কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ের যেসব কমিউনিটি লিডার, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী যৌনকর্মীদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

দেশের আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলোও যৌনকর্মীদের অধিকার প্রশ্নে সচেতন নয় বলে যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য কোনো উদ্যোগ নিতে পারেন না বা নেন না। বহুদিন ধরেই যৌনকর্মীদের জন্য তাদের বসতির পাশে স্যাটেলাইট ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে, যাতে ছোটখাটো চিকিৎসার জন্য বড় হাসপাতালে গিয়ে অপমানিত হতে না হয়। এর পাশাপাশি দরকার এই পেশা থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক নারী এবং যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা।

যৌনকর্মে শিশু

ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশে দেড় থেকে দুই লাখের বেশি যৌনকর্মী আছেন। (Amanullah, 2002; Amanullah and Daniel, 1998; Amanullah and Huda, 2012b; NASP, 2014). যদিও বাংলাদেশের সমাজ যৌনপেশা নিয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে এবং কঠোর মনোভাবাপন্ন কিন্তু এরপরেও সরকার নারী, পুরুষ ও হিজড়া –কারো জন্যই কিন্তু যৌন পেশাকে বেআইনি ঘোষণা করেনি। মধ্যযুগ থেকেই যৌন পেশা বঙ্গভূমিতে চলে আসছে। ব্রিটিশ আমলেও ছিল। তখনো মানুষ এর বৈধতা নিয়ে খুব একটা ভাবত না। দেশের সংবিধানে বলা হচ্ছে, রাষ্ট্র জুয়া ও মাদক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। শিশুকে যৌনকাজে নিয়োজিত করা বা বাধ্যতামূলকভাবে কাউকে এই কাজে নিয়োজিত করা সম্পূর্ণ বেআইনি। এই কাজ যে বা যারা করবে, তাদের জন্য ১০ বছরের জেল ও জরিমানার বিধান আছে। বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড যৌনপল্লিগুলোতে ১৮ বছর বয়সের কোনো নারী যৌনপল্লিতে বাস করাসহ যৌনকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করার আগে হলফনামার মাধ্যমে কাজ শুরু করতে হয়। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারি পাবলিক এবং স্থানীয় থানা এই নিবন্ধন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকে। তবে কর্তৃপক্ষ নারীর বয়স ১৮ বছর হতে হবে এই দিকটির প্রতি বেশ উদাসীন। ফলে বেশ বড়সংখ্যক শিশু যৌন ব্যবসায় জড়িত হয়ে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা বাড়ছে; কারণ, শিশু অপহরণ, শিশুকে পরিত্যাগ এবং পাচারের সংখ্যা বাড়ছে।

কীভাবে কিশোরীরা যৌন ব্যবসায় জড়িয়ে যাচ্ছে

১. কিশোরী ও বয়ঃসন্ধিকালে শরীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে অনেক মেয়ে এ পেশায় চলে আসতে বাধ্য হন।

২. প্রেমিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ও প্রতারণার শিকার হয়ে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বাধ্য করা হয়েছে।

৩. পাচারের শিকার অথবা পরিবারের সদস্যরাই তাদের বিক্রি করে দিয়েছে।

৪. তীব্র অভাব-অনটনের কারণে অথবা মায়ের বয়স হলে যৌনকর্মী মা নিজের সন্তানকে এই পেশায় যুক্ত করেন।

৫. যৌনপল্লির সর্দারনী ও খদ্দেরদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এবং অনিরাপত্তার কারণে অনেক মেয়েসন্তান মায়ের বাবু বা মালিক কর্তৃক দিনের পর দিন ধর্ষণের শিকার হয় এবং পরবর্তী সময়ে তাদের এই পেশা গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

৬. কোনো কোনো মেয়েশিশু টাকার প্রয়োজনেই এ পথে আসে, এরা যৌনপল্লিতে থাকে ও মাদক গ্রহণ করে। মাদকের পয়সা জোগাড় করার জন্যও এরা এই কাজ করে।

৭. হাতেগোনা কিছু কম বয়সী মেয়ে আছে, যাদের মা (যৌনকর্মী) তাদের বারণ করা সত্ত্বেও নিছক কৌতূহল ও মজা করার জন্য এ পথ বেছে নিয়েছে।

যৌনকর্মীর শিশুরা কি পুনর্বাসিত হতে চায়

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের করা যৌনকর্মে নিয়োজিত শিশুবিষয়ক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ কম বয়সী যৌনকর্মী ও যৌনকর্মীর মেয়েশিশুরা বিকল্প কোনো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা পেলে বা কাজের সুযোগ পেলে এবং সামাজিকভাবে অসম্মানিত না হলে এই পেশা ও এলাকা ছেড়ে দিতে চায়। কেউ কেউ এই পেশা ছেড়ে বিয়ে করে সংসার করতে চায়। কেউ আছে যারা আবার বাড়িতে ফিরে যেতে চায়। অল্প ক'জন ছাড়া বাকিরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে কারো না কারো দ্বারা প্রতারিত হয়ে এ পথে এসেছে। তারা মনে করে, শিশুকে যৌন ব্যবসায় নিয়োগের এই চক্রান্ত বন্ধ হওয়া উচিত। তারা কেউ চায় না অল্পবয়সী মেয়েরা এ পথে আসুক; বরং তারা চায় পড়াশোনা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

তবে সরকারি, বেসরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা অল্প বয়সের যৌনকর্মী, অথবা যৌনকর্মীর সন্তানদের পরিচয় জানাজানি হওয়ার পর সমাজের কাছ থেকে তারা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে এবং তখন তারা প্রায় সবাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উত্তরদাতাদের সবাই মনে করেন, সারাদেশে যৌন ব্যবসায় কম বয়সী মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে আশংকাজনকভাবে এবং এটা ঠেকানোর জন্য চাই সমন্বিত উদ্যোগ।

সামগ্রিক উন্নয়ন ভাবনায় সরকারের ভূমিকা

- যৌনকর্মীদের সন্তাদের সমাজের মূলধারার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষাই সবচেয়ে ভালো উপায়। এ কথা বিশেষ করে প্রযোজ্য মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে।
- নিরাপদ আবাসন বা সেফ হোম সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং বিকল্প পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে যৌনকর্মীর সন্তানদের সমাজের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া দরকার।

এর আওতায় নিরাপদ আবাসনে ওই শিশুদের জন্য খাবার, দৈনন্দিন যত্ন, নিরাপত্তা, মৌলিক শিক্ষা, বিনোদনমূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, প্রাক্-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও পরে নিয়মিত বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা উক্ত।

> যৌনকর্মীদের সন্তানদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষাই হতে পারে মূল অবলম্বন

- শিশু অধিকার রক্ষায় প্রচলিত আইনকে কার্যকর করার জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নিতে পারে মূল ভূমিকা, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এই কাজে জড়িত করতে পারে।
- শিশু যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন করা, ঝুঁকিতে থাকা ভাসমান শিশু যৌনকর্মীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।
- বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের যৌনতা ও প্রজননস্বাস্থ্য নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্ক, স্বাস্থ্যঝুঁকি, সুস্থ জীবনের জন্য নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির বিষয়ে জানানো।
- যুগোপযোগী ভোকেশনাল ট্রেনিং সুবিধা বাড়াতে হবে।
- বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত কিশোরী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা করতে হবে সরকারকে, বিশেষত কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ সুরক্ষা প্রটোকল থাকার বিধান চালু করা।
- সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত (মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ) হতে পারে 'মনিটরিং সেল' যারা মাঝেমধ্যে যৌনপল্লি পরিদর্শন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।
- নোটারি পাবলিক কর্তৃক হলফনামা তৈরি করার ব্যাপারে বিশেষ বিধান ও সতর্কতা গ্রহণ করা।
- সঠিক সময়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, পুলিশ যদি জানতে পারে কোনো যৌনপল্লিতে ও হোটেলে শিশুকে যৌন ব্যবসায় জড়িত করা হচ্ছে, তাহলে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার করতে হবে। এবং শিশুকে যত্ন ও নিরাপত্তা দিতে হবে। শিশুকে হয় তাদের বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়া নতুবা পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।
- শিশুদের অধিকার রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে বেশ কিছু আইন, বিশেষ করে শিশু আইন। শিশু যদি অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়, তাহলে পুলিশ তাদের আটক করে বাবা-মায়ের কাছে সোপর্দ করবে। শিশু যদি বড় ধরনের কোনো অপরাধ করে, তাহলে পুলিশ তাকে আটক করে তাদের হেফাজতে নিতে পারবে। বাবা-মাকে জানিয়ে তাদের বিচারের জন্য কিশোর হেফাজতে পাঠিয়ে দেবে।
- কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো।
- যারা এই পেশায় শিশুদের নিয়োজিত করে, তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা।

সমাজের ভূমিকা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় বের হয়ে এসেছে যে, কম বয়সী যৌনকর্মীদের অনেকেই তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায়। তবে ফিরে যাওয়ার পর সমাজ তাদের সহজভাবে মেনে নেবে, এ বিষয়টি তারা নিশ্চিত হতে চায়।

- যৌন পেশায় জড়িত মায়েদের কাছে থাকা তরুণী মেয়েদের বিয়ের ও শিশু-কিশোরীদের পড়াশোনার ও কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন সমাজের উচ্চবিত্ত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী শ্রেণি।
- এলাকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা কম বয়সী মেয়েদের যৌন ব্যবসায় নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে পারেন।
- আশ্রয়চ্যুত শিশুদের জন্য তৈরি করতে পারেন জনসমর্থন ও নেটওয়ার্ক।

বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

- বেসরকারি সংস্থা অর্থাৎ এনজিওগুলোকে নিতে হবে সমন্বিত কর্মসূচি; উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র, শিক্ষা সহায়তা, আইনগত সহায়তা এবং দক্ষতাভিত্তিক ভোকেশনাল ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- শিশুদের যৌন হয়রানির দিকটিকে ফোকাস করে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয় ও দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিতে হবে।
- এনজিওগুলো যৌনপল্লি, হোটেল, বাসাভিত্তিক ও ভাসমান শিশু অথবা অল্প বয়সী যৌনকর্মীদের জন্য অন্যদের সহযোগিতা নিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করতে পারে।
- শিশুদের যৌন হয়রানি বন্ধে ও যৌন ব্যবসায় তাদের ব্যবহার রোধকল্পে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্কিং সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে যৌন পেশা বৈধ না অবৈধ, এটা নিয়ে যেমন দ্বিধাগ্রস্ততা আছে, তেমনই আছে সামাজিক ট্যাবু, প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের অবৈধ আয় এবং রাষ্ট্রের যথাযথ উদ্যোগ ও কার্যক্রম না থাকা। যৌনকর্মীদের জীবন অধিকারহীন মানুষের জীবন, তারা যেন সমাজে থেকেও অচ্ছুত, অদৃশ্য এবং বঞ্চিত। তাই সরকারি-বেসরকারি সংস্থার উচিত যৌনকর্মীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

সূত্র: এমজেএফ স্টাডি অন ইমপ্যাক্ট অব ব্রথেল এভিকশন ইন বাংলাদেশ, ২০১৬

অধিকার ও বাস্তবতা যৌনকর্মী ও তাদের সন্তান

মহুয়া লেয়া ফলিয়া

বাংলাদেশে যৌন পেশা বৈধ না অবৈধ, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে কোনো আইনেই কিছু ব্যাখ্যা নেই তবে এটাও সত্য, বাংলাদেশের বৈধ পেশার যে তালিকা, সেখানে যৌনপেশা অন্তর্ভুক্ত না। এর ফলশ্রুতিতে, যৌনকর্মী এবং তাদের সন্তানরা ন্যূনতম সামাজিক ও আইনী সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যৌনকর্মী ও যৌনকর্ম বিষয়ে দেশীয় আইন ও নীতিমালা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়ায় যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়টি কঠিনতর হয়ে পড়েছে। উপরন্তু সমাজ এটাকে নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চায়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের এই অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ না করার মনোভাবের জন্য যৌনকর্মীরা নাগরিকের প্রাপ্য কোনো সুযোগ বা অধিকার পান না; পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিনিয়তই তারা শিকার হন বিভিন্ন অত্যাচার, নিপীড়ন আর সহিংসতার। তাদের শিশুরাও মায়েদের মতোই ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র।

৯০ এর দশক

৯০ এর দশকের আগে বাংলাদেশে যৌনকর্মীদের অধিকার বিষয়টি তেমন করে কোনো আলোচনাতেই আসেনি। এটি চিরকালই একটি ট্যাবু হিসেবে সমাজে আলোচিত হয়েছে এবং যৌনকর্মীরা সামাজিক ঘৃণা, অপবাদ ও অবজ্ঞার মধ্যেই থেকেছেন। যৌনকর্মীদের ইস্যুটি বাংলাদেশের কোনো উন্নয়ন আলোচনায় নিয়ে আসার কথা তেমন করে ভাবাও হয়নি। ৯০ দশকে এসে ঢাকার ইংলিশ রোড ও নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের যৌনপল্লি[১] উচ্ছেদ করার পর, উচ্ছেদের এই দুটি ঘটনাকে ঘিরে দেশব্যাপী একটি বড় আন্দোলনের সূচনা হয়। বেশ কয়েকটি নারী অধিকার সংগঠন এ নিয়ে একজোট হয়, গঠিত হয় যৌনকর্মীদের প্রতি সংহতি। বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের অধিকারের আন্দোলনের শুরু এভাবেই। এর ওপর ভিত্তি করে যৌনকর্মীরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করেন। নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলাসহ অধিকার আদায়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন তারা।

১ যৌনপল্লি হচ্ছে সরকার স্বীকৃত এলাকা যেখানে নারীরা নোটারি উকিলের মাধ্যমে হলফনামায় স্বাক্ষর করে নির্ধারিত স্থানে বসবাসের সুযোগ পায় এবং যৌনসেবা বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়।

হাইকোর্টের রায়

সে সময় হাইকোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায় পাওয়া যায়, এ প্রসঙ্গে মহামান্য হাইকোর্ট (রিট পিটিশন নং ২৮৭১/১৯৯৯) এক রায়ে বলেন, বাংলাদেশের সমাজে পতিতাবৃত্তি স্বীকৃত পেশা না হলেও এ দেশের আইনে কোথাও এই পেশা গ্রহণে বাধা নেই। যৌনকর্মীরা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হয়ে এই পেশায় যোগ দেন। নিন্দনীয় কিংবা অসম্মানজনক যা-ই হোক না কেন, জীবন ও পেশার স্বাধীনতা এবং নারীর স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার অপরাপর নাগরিকের মতো তাদেরও রয়েছে। তবে পেশা হিসেবে যৌনকর্ম এবং যৌনকর্মীদের অধিকার অর্জনের কার্যক্রম নিয়ে মৌলিক আলোচনা তেমন এগোয়নি। যার ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে উপেক্ষিত ও অনাদৃত অবস্থায় জীবনযাপন করে।

আদতে অধিকার কতটা পেয়েছেন?

যৌনপল্লিতে বসবাসরত নারীদের অধিকাংশই নিরক্ষর, অসহায়, পরিবার পরিচয়হীন, দুস্থ এবং তাদেরকে বিভিন্ন কায়দায় আর্থিকভাবে শোষণ করা হয়। এই মানুষগুলোর বিকল্প কোনো জীবিকার উপায় থাকে না বলে সমাজ তাদের সহজভাবে গ্রহণ করে না, তাই তাদের সাথে যা খুশি তাই আচরণ করা যায়। কারণ এখানে তাদের মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি নেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নারীকে ও কমবয়সী মেয়েদেরকে যৌনকর্মী হওয়ার পথে ঠেলে দেয় এবং তাদেরকে একটি অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য করে।

যৌনকর্মীদের অধিকারের স্বীকৃতি না আসায় যৌনপল্লি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে বহুগুণ। যৌনকর্মীদের জন্য এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় হুমকি এটাই। বিষয়টা দুঃখজনক, কারণ তাদের অধিকারের আন্দোলন শুরু হয়েছে দীর্ঘ প্রায় দুই দশক আগে কিন্তু তাদের ওপর নিপীড়ন না কমে বরং বেড়েই চলেছে।

সামাজিক ও কাঠামোগত বিচ্ছিন্নতা এই মানুষগুলোর জীবনকে অসহায় করে তোলে। বিভিন্ন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয় তারা। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ অনেকাংশে ওই সব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা/প্রথাকে বৈধতা দেয়। বেশির ভাগ যৌনকর্মীই তাদের নিকটজন ও পরিবারের সাথে সম্পর্ক চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রও তাদের অধিকার ও সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে নির্বিকার। এর ওপর আবার তারা নিত্যদিন তাদের বাড়িঘর, কাজের জায়গা মানে যৌনপল্লি থেকে উচ্ছেদের গুরুতর হুমকির মধ্যে থাকে।

সন্তানদের অধিকারও অস্বীকৃত থেকে যায়

যৌনকর্মীদের নিত্যদিনের নিপীড়ন ও বঞ্চনার সাথে জড়িয়ে থাকে তাদের সন্তানরাও। শিশুদের বাবারা তাদের ফেলে চলে যায়। অধিকাংশই এদের অস্তিত্ব স্বীকারও করে না। যৌনকর্মীদের সঙ্গে যৌনপল্লিতে বাস করা মেয়ে সন্তানরা যৌনকর্মকেই তাদের পেশা হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়। আর ছেলেশিশুরা বড় হয়ে অন্যত্র চলে যায় অথবা অনেকেই সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যৌনকর্মীর সন্তান এই পরিচয়টাই তাদের চলার পথকে কঠিন করে তোলে। তারা চাইলেও সমাজের মূল স্রোতোধারায় মিশে যেতে পারে না।

বাংলাদেশে যেহেতু যৌনকর্মীদের অধিকার স্বীকার করা হয় না, এ কারণে সন্তানদের বেশির ভাগের জন্মই রাষ্টের চোখে অদৃশ্য, কারণ তাদের জন্মনিবন্ধনের সমস্যা। সরকারি জন্মনিবন্ধনের ফরমে মা ও বাবা দু'জনের নামই লাগে। যৌনকর্মীদের সন্তানের ক্ষেত্রে অনেকের বাবার পরিচয় তাদের মায়ের কাছেও অজ্ঞাত থাকে কিংবা বাবা ওই সন্তানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চান না। স্কুলে ভর্তির ফর্মেও বাবা-মায়ের দু'জনের নাম লাগে। কেউ কেউ বাবার ভুয়া নাম দিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে পারলেও অনেকের পরিচয় জানার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বের করে দিয়েছে। যৌনকর্মীর সন্তানদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অপেক্ষাকৃত বেশি, কারণ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ প্রায় সকলেই তাদের অচ্ছুত বিবেচনা করে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, যৌনকর্মীদের শিশুরা বুলিংয়ের শিকার হয় হর-হামেশা। সরকারের সমাজসেবা বিভাগ জেলা পর্যায়ে এতিমখানা পরিচালনা করলেও অভিভাবক হিসেবে বাবার নাম উল্লেখের বাধ্যবাধকতা থাকায় অধিকাংশ যৌনকর্মীর শিশুকে সেখানে রাখা সম্ভব হয় না।

মায়ের অভিভাবকত্বের রায়

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ সালে মা এককভাবে তার সন্তানের অভিভাবক হতে পারবে বলে ঐতিহাসিক এক রায় দিয়েছেন। আশা করি উচ্চ আদালতের এই রায়ের ফলে যৌনকর্মী মা তার সন্তানের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবেন এবং তাদের সন্তানেরাও শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা ভোগের সুযোগ পাবে।

বিপর্যস্ত শৈশব

যৌনকর্মীদের সন্তানরা এমন একটি পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেখানকার জীবনযাত্রা, লালনপালন, ভাষা, আচরণ ও রীতিনীতি একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশসহ বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক নয়, উপরন্তু হতাশাজনক সামাজিক জীবন পরিক্রমার মধ্যে তাদের বাস। সেই ছবি মূলধারার সমাজ থেকে পুরোপুরিই বিপরীতমুখী। অথচ যৌনকর্মীর শিশুরা এমন একটা পরিবেশেই বসবাস করতে বাধ্য হয়।

গত কয়েক বছরে যে কয়েকটি যৌনপল্লি উচ্ছেদ ও দখল করা হয়েছে, সেখানকার যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানরা বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। এতে করে যৌনকর্মীরা মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়েছে, তাদের শিশু সন্তানদেরও স্কুল থেকে ঝড়ে পরার হার বেড়েছে।

অন্য বাচ্চাদের একটা জায়গা আছে পরিবারে বা স্কুলে। সবাই তাদের কাছে ডাকে, কারণ তাদের একটা পরিচয় আছে, তাদের একজন বাবা আছেন। আমার বাবা নেই বলে কোন পরিচয়ও নেই। আর তাই সমাজ আমাকে এক ঘরে করেছে।"-যৌনকর্মীর কিশোরী মেয়ে আলো (ছদ্মনাম)

যৌনকর্মীর সন্তানরা এ রকম দমবদ্ধকর একটি পরিবেশে বেড়ে ওঠে বলে মানসিকভাবে তারা বিষণ্নতায় আক্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে। শুধু মানসিক নয়, শারীরিকভাবেও নিগৃহীত ও নিপীড়িত হচ্ছে। বহু পুরুষের সঙ্গে মায়ের শারীরিক সম্পর্ক শিশুদের মনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাবার পরিচয়হীনতা তাদের আরো দুর্বল ও অসহায় করে তোলে। মনের ওপর এ ক্ষতিকর প্রভাব

তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষ, নিজের জীবন ও আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতিহীনতা, সমাজের বিভিন্ন সহিংস আচরণ তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। পিতৃপরিচয়হীন এইসব শিশু অধিকাংশই সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে বড় হচ্ছে। এর ফলে ছেলে শিশুদের অধিকাংশই বড় হয়ে মাদকাসক্তি, চাঁদাবাজি, চুরি ও সহিংসতার মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

মায়েরা খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় শিশুদেরকে দেখার কেউ থাকে না। এই সময়টায় মেয়েশিশুদের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। পুরুষ শিশুরাও যৌননিগ্রহের শিকার হয়ে থাকে যা প্রায়শই তাদের মানসিক সুস্থতার জন্য বাঁধাস্বরূপ হয়। ফলে তারা কম বয়সেই মাদক গ্রহণ বা মাদক ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাদের জন্য না আছে খেলার জায়গা, পড়ার বা বিনোদনের জায়গা, চিকিৎসা সুবিধা এবং আলো পাওয়ার সুযোগ, না আছে শিক্ষা লাভের সুযোগ। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার ফলে নানা রকম অসুখ-বিসুখ তাদের লেগেই আছে। যৌনপল্লিতে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা শিশুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

যৌনপল্লিতে মেয়েশিশুর ঝুঁকি

যৌনপল্লিতে মায়ের সাথে থাকা মেয়েশিশুরা অসহায় ও ঝুঁকির মধ্যে থাকে। মেয়ে শিশুদের বয়স যাই হোক না কেন তারা আত্মীয়স্বজন, মায়ের খদ্দের, প্রতিবেশী তরুণ, যৌনপল্লির বাসিন্দা, 'বাবু' (মায়ের প্রেমিক) বা 'সৎ বাবার' কাছ থেকে মৌখিকভাবে বা ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যৌনকাজের প্রস্তাব থেকে শুরু করে যৌন নির্যাতন ও জোরপূর্বক যৌনকাজের শিকার হয়। তাদের অবস্থা আমাদের ধারণার চেয়েও খারাপ হয়ে থাকে।

অল্প বয়স থেকেই তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় যৌনপেশায় যুক্ত হবার জন্য। একটু বড় হওয়ার সাথে সাথেই তাদের দিকে চোখ পড়ে দালাল ও সর্দারনীদের। মায়েরা না চাইলেও এদের চাপে তারা বাধ্য হয় কন্যাশিশুকে এপথে দিতে। অল্প বয়স থাকায় তাদের মতামত দেওয়ারও কোনো সুযোগ থাকে না, নগদ উপার্জনের লোভও সেই বয়সে সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই মায়ের যৌন পেশাকেই অনেক মেয়েশিশু নিজের পেশা হিসেবে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বেছে নেয়। যেসব অল্পবয়স্ক মেয়ে যৌনপল্লিতে থাকে, তারা বাধ্য হয়ে মায়ের এই পেশা বেছে নেয়। আর একবার এই পেশায় ঢুকে গেলে তাদের আর কোথাও যাওয়ার বা বের হওয়ার পথ থাকে না।

মায়ের পেশা জানার পর বা মা এই পেশা ছেড়ে বিয়ে করলেও পরে পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়লে মেয়ে সন্তানের স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বের করে দেয়। কম বয়সী যৌনকর্মীরা মনে করে, অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কোনো উপায় তাদের হাতে নেই। কোথাও তাদের কেউ চিনতে পারলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হয় তাদের প্রতি। যে কিশোরীরা এই পেশা ছেড়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রে এসেছে, তাদের অভিজ্ঞতাও ভালো নয়। বাসায় ও বাইরে–দুই জায়গাতেই তাদের হেয় হতে হয় এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে খুব কঠোর নিয়মে তাদের রাখা হয়।

বৈষম্যের মাত্রা

যৌনকর্মী মায়েদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈষম্য, হয়রানি ও নির্যাতন স্বাভাবিকভাবেই সন্তানদের ওপর দারুণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই বৈষম্যের কিছু পরোক্ষ প্রভাবও রয়েছে, যেমন মায়েদেরকে ঘর

থেকে উচ্ছেদ করা হলে সন্তানরাও ঘরহারা হয়ে পড়ে। তবে কোনো কোনো পর্যায়ে মায়ের পেশা ছাড়াও তারা নিজের পরিচয় বা পরিস্থিতির জন্যও প্রত্যক্ষ বৈষম্যের শিকার হয়।

যৌনপল্লির শিশুরা মারাত্মক খাবারের কষ্টে ভোগে। খাবারের জন্য তাদের লড়াই প্রতিদিনের। তারা নোংরা ও দূষিত পরিবেশে বাস করে। তাদের অস্বাস্থ্যকর পানি ও শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং নিরাপদ গোসল ও শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ তারা পায় না বললেই চলে। বিশেষ করে মেয়েরা তাদের ঋতুকালীন সময়টাতে কেনোরকম স্যানিটারি সুবিধা পায় না। ফলে নানা ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। যৌনকর্মীদের সন্তানরা স্বাস্থ্যসেবা পায় না। যেমন, যৌনপল্লিতে কোনো স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্র বা স্বাস্থ্য ক্যাম্প নেই। এ কারণে সেখানকার শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে বড় হয় এবং তাদের অসুখ লেগেই থাকে।

"নিজেদের এলাকার বাইরে যেতে আমার ভালো লাগে না। লোকে আমাকে আঙুল তুলে দেখায়। অনেক সময় সমবয়সী ছেলেরা আমার মায়ের নাম ধরে আজেবাজে কথা বলে। যা আমাকে খুব কষ্ট দেয়।" - রাজু (ছদ্মনাম), বয়স ১৩, যৌনকর্মীর সন্তান

স্কুল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীদের সহৃদয়তা ও সচেতনতার অভাবে যৌনকর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সীমিত থেকে যায়। কোনো স্কুলে যৌনকর্মীদের সন্তানরা পড়াশোনা করে জানতে পারলে বাইরের অভিভাবকরা নিজের ছেলেমেয়েদের সেখানে রাখতে চান না। এছাড়া স্কুলের খরচ জোগানও একটা বড় দায়িত্ব, যা তাদের যৌনকর্মী মাকেই বহন করতে হয়। সবাই সেটা বহন করতে পারেন না।

অধিকার এবং স্বীকৃতি

বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ দেশের আইনি কাঠামোতে শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত। আছে সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী যৌনপল্লিতে জন্ম নেওয়া শিশু সমাজের অন্য সব শিশুর মতোই একই রকম অধিকার ভোগ করবে। বাংলাদেশ এ সনদ অনুমোদন করেছে। কিন্তু এ দেশে যৌনকর্মীদের সন্তানরা জন্মের শুরু থেকেই বৈষম্যের শিকার। নিজেদের মৌলিক মানবাধিকারের সুযোগ পেতে তারা বাধার সম্মুখীন হয়। এ কারণে যৌনকর্মীদের সন্তানরা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতি, জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা, উন্নয়ন প্রকল্প, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সিদ্ধান্তের বাইরে থেকে যায়। করোনাকালে আমরা দেখেছি যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানরা কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি অনুদান ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই এখন আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও অবহেলিত শিশু ও তাদের মায়েদের নিয়ে। কীভাবে আমরা সামাজিক ট্যাবু ভেঙে সব শিশুকে একসাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারব, সেই সমাধান আমাদের বের করতে হবে। তাছাড়া মায়ের পেশাগত পরিচয়ের জন্য যেন কোনো শিশু পরিত্যক্ত না হয়, সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করাটাও খুব জরুরি।

সর্বোপরি বলা যায়, একটি শিশুকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম করে তুলতে হলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে প্রচলিত মনোভাব বদলাতে হলে সমাজের বিভিন্ন মহলের সম্মিলিত সমর্থন প্রয়োজন। অভিভাবক, শিশুকিশোর, এলাকাবাসীর পাশাপাশি আইনজীবী, পুলিশ, শিক্ষক, চিকিৎসকের মতো পেশাজীবী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষ, সবাইকে যৌনকর্মীদের শিশু সন্তানদের বিষয়ে মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তনের সময় এখন। তাদের সঙ্গে অনুকূল ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণকে উৎসাহিত করা এবং একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সূত্রঃ

- *মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা*
- *যৌনকর্মী এবং তাদের সন্তানদের অভিজ্ঞতা*

শিকলে বাঁধা জীবনে ডানা মেলার স্বপ্ন

যশোরের কোনো এক এলাকায়, ইমন ও লাবনী নামে দুটি শিশু বেড়ে উঠছে রঙিন স্বপ্ন চোখে নিয়ে, শৈশবের বিহ্বল কল্পনা আর অদেখা আগামীর জন্য দুই শিশুর কোমল হৃদয়ে হাজারো খেয়াল, অনেক প্রত্যাশা। ভিন্ন দুই শিশু, অথচ তাদের জীবনের যে বিড়ম্বনা, প্রতিবন্ধকতা তা একসূত্রে গাঁথা। তাদের গল্প কীভাবে যেন একটি জায়গায় এসে মিলে যায়। দুই শিশুর কচি মনের প্রবল শক্তি ও সংকট প্রকাশিত হয় অভিন্ন আদলে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায়।

পাঁচ বছরের উজ্জ্বল চোখের ইমন, তার মা চম্পাকে (ছদ্মনাম) কেন্দ্র করেই তার গোটা একটি পৃথিবী। এই স্বপ্নের পৃথিবীতে আরো একজন আছেন, তিনি ইমনের নানি, যার কাছে ইমনের বড় হয়ে ওঠা। মায়ের অপত্যস্নেহ ও ভালোবাসা যেন নানি দ্বিগুণ করে দিয়েছেন ইমনের জন্য। কিন্তু তার বাবা? সে এক রহস্যের নাম। কে বাবা, কোথায় থাকে, কেমন দেখতে কিছুই জানে না ইমন। শুধু জানে, তার বাবা অনেক দূরে থাকেন, এত দূরে যে চাইলেও আসতে পারে না। ইমন এই মিথ্যাকে অবলীলায় মেনে নিয়েছে। ছোট্ট ইমন না মেনে নিয়েই-বা কী করবে। তাই ইমন সব ভুলে মেতে থাকে স্কুল আর বন্ধুদের সাথে খেলাধুলায়, স্কুল যেন এক চাঁদের হাট। আনন্দ, উল্লাস, কল্পনাবিলাস – সব আলো যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে শ্রেণিকক্ষে। ইমন স্কুলে পড়ে।

প্রাক্-প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে সে এখন প্রাথমিক স্কুলে পড়ছে। তার স্কুলের নাম আইজউদ্দিন মাতব্বর কান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল খুব ভালোবাসে ইমন। স্কুলে তার অনেক নামডাক। ঠিক যেন ডাকাবুকো খুদে পড়ুয়া। ছবি আঁকার হাত খুব ভালো ইমনের। তাই তো স্কুলের আপামণি তার আঁকা একটি তোতা পাখির ছবি টানিয়ে দিয়েছেন স্কুলের দেয়ালে। সবাই সেই ছবি দেখে আর খুব প্রশংসা করে ইমনের। প্রশংসা শুনতে ইমনের খুব ভালো লাগে।

এত যে আনন্দ, প্রশংসা তার মাঝেও শিশু ইমনের মনে মাঝে মাঝে বিষাদ ছায়া ফেলে। ইমন আনমনা হয়ে ভাবতে থাকে কেন তার মাঝে মাঝে এমন লাগে। সে অনেক ভেবে দেখেছে যে, যখন তার মায়ের দিকে অন্যরা ভিন্ন চোখে তাকায়, কেমন যেন তাদের সেই দৃষ্টি সেখানে কোনো স্বাভাবিকতা নেই, এক অদ্ভুত কৌতূহল আছে ইমন মাঝে মাঝে মানুষের নিচু স্বরে কথা বলা দেখেছে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারেনি। তবে তারা যে তার মাকে নিয়েই বলেছে, আর সে কথা যে ভালো কোনো কথা নয়, এতটুকু সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কেন সবাই তার মাকে এভাবে দেখে, কী বলে তা সে বুঝতে পারে না। তবে তার মা যে তার বন্ধুদের মা থেকে আলাদা, এটা সে বুঝতে পেরেছে।

ইমনের মা চম্পা। পেশায় একজন যৌনকর্মী। সিএন্ডবি ঘাট যৌনপল্লি, ফরিদপুরের আইজউদ্দিন মাতব্বর ডাঙ্গি পাড়ায় বাস করেন। ইমনের জন্ম এই যৌনপল্লিতেই। সিএন্ডবি ঘাট যৌনপল্লির অবস্থা এখন এতই খারাপ যে ইমনের মা যা আয় করে তা দিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করাই দুরূহ, সেখানে ছেলের লেখাপড়া চালানো সামর্থ্য তার আর হয় না।

নতুন স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে চম্পাকে প্রথমে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তবু সে অনেক চেষ্টা করে ইমনকে স্কুলে ভর্তি করাতে সমর্থ হন। নতুন স্কুলে ভর্তি হবার পর ইমনকে তার মা নতুন স্কুলের জামা কাপড় কিনে দিয়েছেন। সাথে একটি নতুন স্কুলব্যাগও দিয়েছেন। সেই ব্যাগে স্পাইডারম্যানের ছবি। আহা, স্পাইডারম্যান তো ইমনের খুব পছন্দ। ইমনের মাঝে মাঝে স্পাইডারম্যান হতে ইচ্ছা করে। ইমনে আরো ইচ্ছা করে স্কুলের শিক্ষক হতে। কারণ, এই স্কুলের আপামণি ও স্যাররাও অনেক ভালো। সবাই তাকে কত আদর করেন।

ইমন ভাবে যে, সে যদি স্কুলে শিক্ষক হতে পারে তাহলে তার স্কুলে ধনী-গরিব সবাইকে ভর্তি হতে দিবে, কোনো ভেদাভেদ রাখবে না। তার মতো পাড়ায় যে বাচ্চারা থাকে, সেই বাচ্চাদের সবার আগে স্কুলে ভর্তি করে নিবে। ইমনের আরো একটি স্বপ্ন আছে। বড় হয়ে মাকে সে সুন্দর একটা বাড়ি বানিয়ে দিবে যেখানে ইমন, তার মা আর নানি থাকবে, যেখানে তারা থাকবে ভালোবাসায়, আনন্দে, নিরাপদে। আর ঘরের দেয়াল জুড়ে থাকবে নানা রকম ছবি। আর সে ছবিগুলো আঁকবে ইমন।

লাবনীর কথা

অন্যদিকে শহরের আরেক প্রান্তে যে লাবনী বাস করে তার জীবন ইমনের মতো এত আনন্দময় নয়, সেখানে তাকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ তার প্রশংসা করে না। লাবনীর ভাগ্যে জোটেনি মা-বাবার আদর, পরিবারের উষ্ণতা। বরং গালমন্দ, বঞ্চনা আর তাচ্ছিল্যই যেন তার জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি। সে দেখেছে তার বয়সী ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাড়িতে মা-বাবার সাথে থাকে। অথচ তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে এনজিও পরিচালিত একটি আশ্রয়কেন্দ্রে, লাবনী সেই আশ্রয়কেন্দ্রকেই আপন ঘর হিসেবে মনে করে। যেখানে নিজেদের বাড়িতে অন্য ছেলেমেয়েরা মা-বাবার আদর-ভালোবাসায় বড় হয়, সেখানে লাবনীর কপালে জোটেনি মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা। মা তাকে সময়ই দিতে পারে না।

মেয়েটি তার কষ্টকে চেপে রেখে বলে, **"স্কুলে সহপাঠীদের সাথে মিশতে পারতাম না, খেলতে পারতাম না, রাস্তা দিয়ে যখন যেতাম তখন অনেক ছেলেরা বাজে কথা বলত। সবাই ভাবত আমি যৌনকর্মীর মেয়ে, তাই আমাকে খারাপ কথা বললে কেউ বাধা দিবে না। সত্যিই তাই, স্কুলের স্যারদের কাছে অভিযোগ করলে, তারাও আমার পক্ষে কথা বলত না। আমাকেই বেশি দোষারোপ করতো, বলত তুমি একটু ভালো হয়ে চলো।"**

লাবনী বুঝতে পারে না, যে তার মা যৌনকর্মী হলেও একজন মানুষ, সে যৌনকর্মীর সন্তান হলেও একজন মানুষ, আর এই জীবন তো তারা নিজে বেছে নেননি। তার জন্মের জন্য তো সে দায়ী নয়, তাহলে কেন তাকে এই সব কটুকথা শুনতে হবে। কেন সবাই তাকে তাচ্ছিল্য করবে, উপহাস করবে, কেন তার জীবন অন্য সব শিশুর মতো নয়। লাবনীর ইচ্ছে করে নাচ শিখতে, নাচতে তার খুব ভালো লাগে, ইমন যেখানে তার ভালো লাগার কাজটি আনন্দ নিয়ে করতে পারে, লাবনীর সেখানে শত বাধা, প্রতিকূলতা। লাবনীর ইচ্ছে করে একদিন নাচ শিখে সে-ও ডানা মেলে উড়ে যাবে প্রজাপতির মতো, মেঘের মতোন উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াবে।

অপূর্বর স্বপ্ন

“মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছো পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।”

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটি যখন অপূর্ব আবৃত্তি করে, তখন তার কেবলই মনে হয় সে একটা প্লেন চালাচ্ছে। আকাশে ভেসে ভেসে উড়ে যাচ্ছে। আর পেছনে বসে আছে তার মা। প্লেনের জানালা দিয়ে মা তুলোর মতো মেঘগুলো দেখছে, ঝকঝকে নীল আকাশে আনমনে তাকিয়ে আছে। আর সে মাকে নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে। যদিও অপূর্ব কাছ থেকে কখনো প্লেন দেখেনি, সে জানেও না প্লেনে কতজন মানুষ বসতে পারে, এটা কীভাবে চলে– কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে যে, ও প্লেন চালাচ্ছে। ওকে ওর স্কুলের টিচার বলেছে যে যারা প্লেন চালায়, তাদের পাইলট বলে। তাই অপূর্ব স্বপ্ন দেখে ও পাইলট হবে। মাকে দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখাবে।

এই ছোট্ট শিশুটির মায়াভরা চোখ দেখে কোহিনুর শখ করে ছেলের নাম রেখেছিল অপূর্ব। জন্মের পর থেকে অপূর্ব মায়ের সাথেই থাকে। তার বাবাও আছে কিন্তু সে দেখেছে তার বাবা তাদের সাথে থাকে না, বাইরে অন্য কোথাও থাকেন। কেন বাবা তাদের সাথে এখানে থাকে না, এ প্রশ্নটি তার ছোট মনে মাঝেমাঝে উঁকি দিলেও, সে বুঝতে পেরেছে এর উত্তর সে পাবে না। কারণ মা সবসময়ই এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন।

অপূর্বের বয়স এখন ৭ বছর। তার মা কোহিনুর (ছদ্মনাম) একজন যৌনকর্মী। জন্ম থেকেই সে তার মায়ের সাথে যৌনপল্লিতে থাকে। অপূর্বর বাবার আরো একটি সংসার আছে যৌনপল্লির বাইরে। বাবা নামের এই মানুষটি অপূর্ব আর তার মায়ের খোঁজখবর নেয় না বললেই চলে। অথচ তিনিই নাকি তার বাবা।

তার মায়ের কথায় "অপূর্ব যাকে বাবা বলে জানে, সে আসলে নামেই বাবা, আমি তার স্ত্রী, তবে সেটাও কেবলই একটি পরিচয়, আমি তাকে ভালোবাসি, স্বামী হিসেবেই মানি, জানি যে সে কখনোই আমাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়নি, অপূর্বকেও সন্তান পরিচয় দিতে তার দ্বিধা। কারণ তার আলাদা সংসার আছে, সেখানে তার স্ত্রী-সন্তান আছে, যাদের সে ভালোবাসে। কিন্তু আমার কাছে কেন সে আসে, আমার উপার্জন, আমার টাকার জন্য। আমি তাকে টাকা দেই, বিনিময়ে সে আমাকে একটি পরিচয় দিয়েছে। ব্যস, এই পর্যন্তই।"

মায়ের কাছেই অপূর্বর যত বায়না, আবদার। অপূর্ব লেখাপড়ায় আগ্রহী দেখে কোহিনুর অপূর্বকে একটি উন্নয়ন সংস্থার প্রি-প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। এই স্কুল থেকে সে বাংলা, ইংরেজি, অংক –প্রতিটি বর্ণমালা লিখতে ও পড়তে শিখেছে এবং বানান করে সে বাংলা পড়তে পারে। এছাড়া চমৎকার ছবি আঁকতে ও আবৃত্তি করতে পারে অপূর্ব। অপূর্ব স্বপ্ন দেখে তার ও মায়ের নিশ্চিন্ত জীবন যেখানে অপমান, বঞ্চনা থাকবে না। তাই সে নিজেকে তৈরি করছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য।

বিথীরা মরেই বেঁচে যায়

মানুষের জীবন বড় বিচিত্র, জন্ম কিংবা পরিবেশই কেবল মানুষকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে না, বরং মানুষ হিসেবে জন্মের ফলেই প্রতিটি মানুষ আলাদা একটি সত্তা নির্মাণ করে। বিথী (ছদ্মনাম) একজন যৌনপল্লিতে জন্ম নেওয়া শিশু। তার দুই বোন যৌন পেশায় থাকলেও বিথীর স্বপ্ন ছিল অনেক বড়, সে তার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে পেছনে ফেলে ছুঁতে চেয়েছিল তার স্বপ্নের সীমা। একজন ডাক্তার হয়ে, সাদা অ্যাপ্রোন গায়ে চড়িয়ে মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়েই পড়াশোনা করছিল।

কিন্তু বিথীর সব স্বপ্ন ভেসে গেল, বেছে নিতে হলো মৃত্যুকে। মৃত্যুর পরে ঠাঁই মিলল যৌনকর্মীদের জন্য নির্ধারিত গোরস্থানে। অথচ সে জীবিত থাকা অবস্থায় কখনোই এই যৌন পেশাকে ও সেই পরিচয়কে গ্রহণ করেনি। বিথী ছিলো দৌলতদিয়া যৌনপল্লিতে জন্ম নেয়া একজন শিশু। মা ও তিন বোন নিয়ে তার পরিবার। দুই বোন যৌন ব্যবসায় যোগ দিলেও বিথী দেয়নি। বিথী চেয়েছিল পড়াশোনা করে বড় হতে এবং এই জগৎ থেকে মাকে নিয়ে পালাতে।

বিথী পড়াশোনা করত ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে। কিন্তু যাতায়াতের সময় এলাকার এক প্রভাবশালী নেতার ছেলে, বিথীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। বিথী প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হলে ওই যুবক বিথীকে স্কুলে যাতায়াতের পথে এমনকি যৌনপল্লির ভিতরে তার বাসায় গিয়ে সব সময় বিরক্ত করত। স্কুলে যেতে বাধা দিত। বিথী ওই যুবকের প্রস্তাব ও বিভিন্ন মানসিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে স্কুল কর্তৃপক্ষ যৌনপল্লির কর্মরত এনজিওরা ওই যুবককে এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সালিসে বসে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল। এরপর কিছুদিন সমস্যা না হলেও একদিন ঐ ছেলেরা বিথীর মাথার চুল কেটে দেয় এবং প্রকাশ্যে মারধর করে বিথীকে আহত করে। বিথী ওই যুবকের অত্যাচারে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

এই মানসিক আঘাত বিথী মেনে নিতে পারেনি, সে এতটাই হতাশ ও অসহায় হয়েছিল যে, ক্রমে বিথী নেশার প্রতি ঝুঁকতে শুরু করে। তার জীবনে যেন কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, সাধ নেই। বিথী স্পষ্টই বুঝতে পেরে ছিল যে এই সংসারে, সমাজে তার আর কোনো আশ্রয় নেই, ভরসার জায়গা নেই, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জায়গা নেই। বয়স কম বলে বোনেদের কাছে আসা খদ্দেররা বিথীকে পছন্দ করত ও বাজে প্রস্তাব দিতো। একপর্যায়ে বোনেরাও জোরজবরদস্তি শুরু করে। কিন্তু বিথী কখনোই সায় দেয়নি, হার মানেনি, কারণ সে কোনোদিনই চায়নি এই পথে যেতে।

তাই বোনদের ও তাদের কাছে আসা খদ্দেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে একরাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। সাঙ্গ করে সকল আয়োজন, খদ্দেরদের লোভ, বখাটের উৎপাত, বোনদের বাড়তি আয়, আর চপেটাঘাত করে সমাজের গালে। বুঝিয়ে দেয় এই সমাজের বাস্তবতা জীবন দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করেছে বিথী। কেউ এগিয়ে আসেনি যখন, তখন আত্মদানই তার কাছে শ্রেষ্ঠ সমাধান মনে হয়েছে। অথচ ভালোভাবে পড়াশোনা করে বিথী ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, যা কিনা সেই বখাটেরা ভেঙে দেয়, এই স্বপ্নভঙ্গ আর যৌনপল্লির আবদ্ধ জীবন তাকে ঠেলে দেয় আত্মহননের পথে। এর জন্য দায়ী কে? বিথী, বিথীর স্বপ্ন, বখাটে, বিথীর বোন, সমাজ না কি রাষ্ট্র। সভ্যসমাজের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে গেল বিথী।

বিথীর ভোগান্তি আর না পাওয়া যেন মৃত্যুর পরেও শেষ হয় না। শুধু একজন যৌনকর্মীর সন্তান – এই পরিচয়ের কারণে তাকে সমাজের মূল কবরস্থানে সমাহিত হতে দেয়নি এই সমাজের প্রভাবশালীরা। যাদের মাস্তান ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিথীকে জীবন দিতে হলো, সেই তারাই বিথীকে কবরে শোয়ার অধিকারটুকুও কেড়ে নিল। যৌনকর্মীর সন্তান বলে তাকে সমাহিত করা হল যৌনকর্মীদের জন্য নির্ধারিত গোরস্তানে। এখানেও বিথী হেরে গেল, আমরা হেরে গেলাম বিথীর কাছে। আমরা এভাবেই হেরে যাই প্রতিদিন। এই সমাজে বিথীর মতো হাজারো বিথী এভাবে মরেই বেঁচে যায়।

ভালো থেকো ফুল, শিউলী, বকুল

একদিন চোখে স্বপ্ন নিয়ে বড় হতে চেয়েছিল যশোরের প্রত্যন্ত গ্রামের কিশোরী চম্পা (ছদ্মনাম)। পরিবারের তীব্র অর্থ সংকট, অন্যদিকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা চম্পাকে মনে মনে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য, সে এমন একটা জীবন বেছে নিয়েছিল, যে জীবন ছিল অন্ধকারে ঢাকা। মন্দ মানুষের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছিল সে।

প্রতারণা করে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল যৌনপল্লিতে। এই জগৎ এতটাই অন্ধকারে ঘেরা যে সেখানে স্বপ্ন-আশা বলতে কিছু থাকে না, সেই জগতে আলোরও যেন প্রবেশ নিষেধ, কেউ কাউকে সাহায্য করে না, কারো মধ্যে বোধবুদ্ধি, মানবিকতা কাজ করে না। এত দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও চম্পা তার স্বপ্ন বুকে পুষে রেখেছিল।

অন্ধকার জগতেই একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাকে বিয়ে করে যৌনপল্লি থেকে বেরিয়ে যায় কিশোরী থেকে সদ্য তরুণী হওয়া মেয়েটি। কিছুদিনের মধ্যে সে গর্ভধারণ করে। সেই সময়ই চম্পার স্বামী তাকে একা ফেলে চলে যায়। আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ হয় চম্পার।

হতাশ হয়ে গর্ভপাত করার কথাও ভাবে সে। কিন্তু তার মন তাতে সায় দেয় না। একটি ফুটফুটে মেয়ে সন্তানের মা হলো। সন্তান হওয়ার পর স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে কিন্তু স্বামী আর ফিরে আসে না। একদিন সন্তান কোলে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ে স্বামীর খোঁজে। স্বামীর খোঁজ পেলেও, স্বামী তাকে আর গ্রহণ করে না।

বাধ্য হয়ে সে আবারো ফিরে যায় যৌনপল্লিতে। একে একে তিন মেয়ে হয় তার। নিজের স্বপ্ন ভেঙে গেলেও মেয়েদের মানুষ করার স্বপ্ন রয়েই যায় চম্পার মনের ভিতরে। মেয়েরা একটু বড় হওয়ার পর যৌনপল্লির বাইরে বাসা ভাড়া করে তাদের রাখার ব্যবস্থা করে। চম্পা কখনো চায়নি মেয়েরাও তার মতো এই অন্ধকার জগতে জড়িয়ে পড়ুক।

স্থানীয় একটা বেসরকারি সংস্থার স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করান। কিন্তু স্কুলের বাইরের পরিবেশ তেমন ভালো ছিলো না। বখাটে ছেলেরা প্রায়ই মেয়েদের উত্ত্যক্ত করত। এ বিষয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানালেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে সেই স্কুল থেকে সরিয়ে মেয়েদের অন্য একটি সংস্থার স্কুলে ভর্তি করান। বড় মেয়ে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক জটিলতার কারণে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। এই অকৃতকার্যতার পর স্কুলের শিক্ষক তাকে কটূক্তি করে মায়ের পেশা নিয়ে। এতে স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটি অপমানিত হয়ে সেই স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে।

পরেরবার এসএসসি পরীক্ষায় সে ভালো ফল করে অন্য স্কুল থেকে। সেই মেয়েটিই এখন ঢাকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেছে। চম্পার স্বপ্ন, তার বড় মেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে দেশের বাইরে যাবে এবং পাস করে এসে ভালো চাকরি করবে। সেই সঙ্গে অন্য বোনদেরও পড়াশোনা শেষ করাবে।

চম্পা বলেন, “আমার স্বপ্ন এখনো মরে যায়নি। আসলে স্বপ্ন কখনো মরে না। এখন স্বপ্ন মেয়েদের ঘিরেই। আমি চাই মেয়েরা দেশের বাইরে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছাক, যেখানে কেউ তাদের মায়ের পেশা বা অতীত দিয়ে তার মেয়েকে বিচার করবে না। যেখানে তারা পরিচিত হবে তাদের কাজের মাধ্যমে।”

জীবনযোদ্ধা চম্পা নিজের জীবনের নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বপ্ন ও আশা পূরণ করতে না পারলেও তার মেয়েরা যেন স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে যায় জীবনের পথে, তাই তো তার প্রার্থনা– ভালো থেকো ফুল, শিউলি, বকুল।

ইচ্ছা ও মনোবলই ছিল মিষ্টির শক্তি

মিষ্টি নামের মেয়েটি তার নামের মতোই মিষ্টি, তার গানের গলা যেন আরো মধুময়। মিষ্টির জীবনটা হওয়া উচিত ছিল মসৃণ, সুন্দর ও আলোকিত। কিন্তু তার চলার পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। কারণ মেয়েটির জন্ম হয়েছিল দৌলতদিয়া যৌনপল্লিতে এবং মা পেশায় একজন যৌনকর্মী ছিলেন। মা থাকলেও জন্মের পর থেকে সে মায়ের কাছে থাকতে পারে নাই, পায় নাই মায়ের আদর ভালোবাসা।

১৯৯৪ সালে মিষ্টির জন্মের পর তার মা কখনো চাননি মেয়ের গায়ে তার পেশার ছোঁয়া লাগুক। যৌনপল্লির দালালদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য জন্মের পরই অনেক টাকা খরচ করে মেয়েকে

যৌনপল্লির বাইরে অন্য মানুষের কাছে রেখে বড় করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেখানেও তাকে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের শিকার হতে হতো। মিষ্টির মা মেয়ের জন্য খাবার দিলেও যারা তাকে রেখেছিল, তারা তাকে পর্যাপ্ত খাবার দিতো না, অকারণে মারধর করত।

পাঁচ বছর বয়সী মিষ্টির এই কষ্টের কথা মা জানার পর তিনি তাকে রাজবাড়ীর একটি বেসরকারি সংস্থার সেফ হোমে রেখে আসেন। সেখানে সে লেখাপড়া করতে থাকে। এরপর আসে আরেক ধাক্কা সেফ হোমের নিয়ম অনুযায়ী অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ার সময় সেফ হোম থেকে মিষ্টিকে ফেইজ আউট করে দেয়। তখন মিষ্টির থাকার কোনো জায়গা না থাকায় রাজবাড়ীর একটি মেসে থেকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকে। সেখানেও তাকে বারবার বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। বিভিন্ন ছুটি বা উৎসবে মেসের মেয়েরা বাড়িতে যেত কিন্তু সে যেতে পারত না, মেসে একা একা থাকত।

মিষ্টি জানাল, "যত কষ্টই হোক পড়াশোনা করে মাকে সেই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসব, এটাই ছিল আমার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমি মুখ বুজে সব সহ্য করে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছি।" এরই মধ্যে ২০১৩ সালে মিষ্টি স্থানীয় একটি সংস্থায় কাজের সুযোগ পায় এবং সেখানে সে কাউন্সিলর পদে চাকরি করার পাশাপাশি পড়ালেখা চালিয়ে গিয়েছে। চাকরি পাওয়ার পর মিষ্টি গোয়ালন্দে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে মাকে নিয়ে থাকত, পরে সে অন্যত্র চাকরি পায়।

মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বাঁচার ইচ্ছা, মনোবল ও মায়ের সহযোগিতায় মিষ্টি আজকে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মসূচি সমন্বয়ক। মাকে কষ্টকর পেশা থেকে বের করে এনে গ্রামের বাড়ি পাবনাতে ঘর তুলে দিয়েছেন এবং তার মা সেখানে গিয়ে থাকছেন।

শুধু তা-ই নয়, মিষ্টি বিয়ে করেছেন, সংসার করছেন। অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স পাস করেছেন। যে কঠোর কঠিন অস্পৃশ্য মানুষের জীবন তারা পার করে এসেছেন, সেই জীবনকে তারা আর মনে রাখতে চান না। কারণ, সেই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মা, মেয়ে দুজনের জন্যই ছিল চরম খারাপ অভিজ্ঞতা।

মিষ্টির অটুট মনোবল, দৃঢ় প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাসের কারণেই হাজারো প্রতিবন্ধকতা আসার পরেও সে থেমে থাকেনি, লড়াই চালিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মাকে মুক্ত করেছে অন্ধকার জগতের গণ্ডি থেকে।

পরিচয়ের সংকটে রুনা

রুনার ইচ্ছে ছিল সংসার করার কিন্তু জীবনে তাকে বারবার প্রতারিত হতে হয়েছে। আর এই প্রতারণা ও পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে যশোরের মেয়ে রুনাকে ঠাঁই নিতে হয়েছিল যৌনপল্লিতে। সেখানে সে চার সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু যৌনপল্লির অসহনীয় পরিবেশে সন্তান বড় করা খুবই কষ্টের। তাই রুনা প্রথমেই তার মেয়েকে বোনের অভিভাবকত্বে দিয়ে দিয়েছিলেন। স্কুল কলেজে ভর্তির সময় জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন হয়, বাবা-মায়ের পরিচয়পত্র দিতে হয়। রুনার এগুলো কিছুই ছিল না।

এরপরেও স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে যৌনকর্মীর সন্তান হওয়ায় তার দুই ছেলেকে বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। বাবা মায়ের পরিচয়পত্র ও বাবার নাম না থাকায় স্কুল তাদের ভর্তি করতে চাইছিল না। রুনা নিজে জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করতে গেলে, সেখানেও ঝামেলা হয়। কর্তৃপক্ষ বাসার

বাড়িওয়ালার পরিচয়পত্র, বিদ্যুৎ বিলের কপি এবং তার মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়েছিল। কিন্তু রুনার মা অনেক আগে মারা গিয়েছেন বলে তার কোনো জাতীয় পরিচয়পত্র ছিল না। ফলে রুনা নিজেও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারেননি।

তাই সব সন্তানের পরিচয়পত্রের জন্য রুনাকে বোনের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। রুনার মেয়ে ২০২২ সালে এইচএসসি পাস করেছে। মেয়ের স্বপ্ন সে ডাক্তার হবে। কিন্তু সেই আর্থিক অবস্থা রুনার নেই যে মেয়েকে মেডিকেলে পড়াবেন। হয়তো এখন মেয়েকে অন্য কোনো সাবজেক্টে পড়তে হবে। তবু আশা করছেন মেয়ের জীবনে ভালো কিছু হবে।

অন্যদিকে রুনার বড় ছেলে মায়ের কাছে থাকলেও খুব একটা ভালো ছিল না। ছেলে বড় হচ্ছিল। তার মা রাতে বাসায় থাকেন না কেন, কোথায় থাকেন এগুলো নিয়ে মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। তাই রুনা এই ছেলেকেও বাধ্য হয়ে রুনার বাবার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই ছেলে পড়াশোনা করেনি, শ্রমিক হিসেবেই কাজ করছে।

রুনা বলেন, "এত প্রতিকূলতার মাঝেও আমি চাই আমার বাকি সন্তানরা যেন পড়াশোনা শিখে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন যৌনকর্মী হয়ে সমাজে যতটা ঘৃণা, অবহেলা ও অশ্রদ্ধা পেয়েছি, আমার সন্তানেরা যেন সেই অশ্রদ্ধা না পায়। সন্তানদের একটি সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন দেওয়াই একজন মা হিসেবে আমার একমাত্র স্বপ্ন।"

এক মায়ের স্বপ্ন

বাবা অসময়ে মারা যাওয়ার পরে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান শিউলি আক্তারকে খুব ছোটবেলাতেই তার মা বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের কারণে স্বামীর ঘর করতে পারেননি শিউলি। কিন্তু কিশোরী শিউলি স্বামীর ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসার পরেই প্রতারিত হন এবং যৌনপল্লিতে তার ঠাঁই হয়।

বাবা না থাকায় মা এবং অন্য বোনদের দায়িত্বও এসে পড়ে তার ওপর। যৌনপল্লিতে কাজ করে সংসারের খরচ মেটাতে থাকেন তিনি। একসময় আবার বিয়ে করেন। এক ছেলে ও এক মেয়ে হয় তার। মেয়ের যখন মাত্র ১১ বছর বয়স, তখনই ভয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন তিনি, যেন তার জীবনের মতো মেয়ের জীবন না হয়।

শিউলি যৌন পেশা ছেড়ে বের হতে পারেননি পুরোপুরি। কারণ স্বামীর যা আয় হয় মাছের ব্যবসা থেকে, তাতে ব্যয় সংকুলান হয় না। কারণ তার স্বামীর আরেকজন স্ত্রী রয়েছেন এবং স্বামীকে সেই পরিবার চালাতে হয়। যৌন পেশার পাশাপাশি শিউলি ছোটো একটা চায়ের দোকান চালান, তা দিয়ে যেটুকু আয় হয়, তা দিয়ে ছেলের পড়াশোনার খরচ মেটানোর চেষ্টা করেন। স্বামী আছে বলে সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছেন। শিউলির ছেলে নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছে।

কঠোর পরিশ্রম করে শিউলি ছেলের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিউলী বলেন, "আমি আশা করছি যে আমার এই ছেলেই একদিন পারবে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবে। দারিদ্র্য, নির্যাতন ও বিয়ে বিচ্ছেদের পর আমার নিজের আর কোনো স্বপ্ন ছিল না। আমি এখন শুধু ছেলেকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখি...।"

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!

স্কুলের অভিভাবক দিবসে পুষ্পর মা কখনো আসতে পারত না। শহরে ভাইবোনেরা যে বাসায় থাকত, সেখানে তাদের মায়ের পরিচয় কোনোভাবে জানাজানি হয়ে গেলে, সেই বাসাও সাথে সাথে ছেড়ে দিতে হতো। শৈশব-কৈশোরে তার ছিল না কোনো অভিভাবক, ছিল না পথপ্রদর্শক। একদম একা একা বিচ্ছিন্নভাবে এবং এ রকম একটা অসহনীয় পরিবেশে পুষ্প ও তার ভাইবোনেরা বড় হয়েছে।

এখন পুষ্প বিদেশে গিয়ে আরো পড়াশোনা করে সেখানে স্থায়ী হতে চায়। কারণ সে তার মায়ের পরিচয়ের গ্লানি ও ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মা যৌনকর্মী বলে প্রতিনিয়ত তাদের সব ভাইবোনকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাই এমন একটা দেশে গিয়ে পুষ্প থাকতে চায়, যেখানে কেউ তাকে ও তার ভাইবোনদের পরিচয় জানতে চাইবে না, কটূক্তি করবে না, ঘর থেকে বের করে দেবে না।

পুষ্প বলেন, "আমরা মায়ের পরিচয় সবসময় লুকিয়ে রেখেছি। কাছের বন্ধুদেরও জানতে দেই নি। আমার সেই অর্থে কোনো অভিভাবক ছিল না। কিন্তু আমি আমার ভাই বোনদের অভিভাবক। আমি এখন উচ্চশিক্ষিত হয়েছি। বাইরের দেশে গিয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাইবোনদেরও আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এটাই এখন আমার একমাত্র স্বপ্ন।"

পুষ্প আজ সংগ্রামী তরুণী। যশোরের যৌনপল্লির একজন যৌনকর্মীর কন্যাসন্তান সে। পুষ্পর মা কখনোই চাননি মেয়ে তার পেশায় আসুক। তাই পুষ্পর বয়স যখন পাঁচ মাস, তখন তার মা তাকে যৌনপল্লির বাইরে আলাদা বাসা ভাড়া করে রাখেন। সেখানে তাকে দেখাশোনার জন্য লোকও রেখে দেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার এসে দেখে যেতেন সন্তানকে। পুষ্পর আরো তিন ভাই বোন আছে।

স্থানীয় এক সংগঠনের সহায়তায় পুষ্পর মা তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। পুষ্প খুব ভালো স্কুল-কলেজ থেকে পাস করেন। মা যতই তাদের আগলে রাখার চেষ্টা করেন না কেন, পুষ্পর স্কুল ও কলেজ জীবন আর দশটা মেয়ের মতো সুন্দরভাবে কাটেনি। বাবার পরিচয়, মায়ের পেশাগত পরিচয় সবসময়ই লুকিয়ে রাখতে হতো সবার কাছে। এমনকি কাছের কোনো বন্ধুবান্ধবকেও জানতে দেয়নি।

পুষ্প স্নাতক ও এমবিএ পাস করে একটি টিভি চ্যানেলে ইন্টার্নশিপ করছিল কিন্তু ছোটবেলার দুঃসহ স্মৃতি, মায়ের পেশাগত জীবনের নেতিবাচক দিকটার কারণে সে নারী পুরুষের বন্ধুত্ব, যৌন সম্পর্ক–এই বিষয়গুলো ঠিক সহজভাবে নিতে পারত না। ফলে মিডিয়া থেকে সরে দাঁড়ায় সে। মায়ের জীবনের সংগ্রাম, লজ্জা, না পাওয়ার যন্ত্রণা, অসম্মান, দারিদ্র্য ও অন্ধকার দিকটা পুষ্প দেখেছে। তাই ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে বড় হওয়া, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া–যেন সে তার মায়ের জীবনের সব অপূর্ণতা, না পাওয়াগুলো পূরণ করতে পারে। পুষ্প এখন বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নতুন এক পরিচয়ের স্বপ্ন দেখে তুলসী

তুলসীমালা যৌনকর্মী হলেও একজন মা। সন্তানের জন্য মায়ের রয়েছে অপত্যস্নেহ। অথচ শুধ যৌনকর্মী হওয়ার কারণে ও সন্তানদের পিতৃপরিচয় না থাকায় খুব কষ্ট তার বুকে। তিনি বলেন, "একজন

মা হয়ে সন্তানদের জন্য অনেক কিছুই করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু করতে পারি না আমার পরিচয় ও স্বল্প আয়ের জন্য। এরপরেও সাধ্যমতো চেষ্টা করি। সব জায়গায় আমার পরিচয় লুকিয়ে রাখতে হয়। শুধু দূর থেকেই খোঁজখবর নেই আর ওদের জন্য টাকা পাঠাই। আশা করি ছেলেমেয়েরা একদিন বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, মায়ের এই ক্লেদাক্ত পরিচয় মুছে দেবে। আমাকেও আর এত কষ্ট করতে হবে না।"

তুলসীমালা, গ্রাম থেকে শহরে কাজ খুঁজতে এসে যৌন পেশায় জড়িয়ে পড়ে। অল্প বয়সেই অন্ধকার জগতে জড়িয়ে পড়ায় জীবনটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল তার। কোনো কিছু বোঝার আগেই এত বড় ধাক্কা খেয়েছে যে কিছু আশা করতেই ভুলে গেছে।

যৌনপল্লিতে এসে স্বামী বা সংসার না পেলেও চারটি সন্তানের মা হয়েছেন তুলসীমালা। দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়েকে এসএসসি পর্যন্ত পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। আর দুই ছেলেকে ভর্তি করিয়েছেন মাদ্রাসায়। ছেলেমেয়েদের অনেক কষ্টে মানুষ করার চেষ্টা করছেন। কারণ ছেলেমেয়েদের জীবন, তার জীবনের মতো অন্ধকার হোক তা তিনি চান না।

মা হিসেবে নিজের কাছে রেখে নিজ পরিচয়ে সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাটাই ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। তাই সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করার জন্য তুলসীমালাকে সাহায্য নিতে হয়েছে তার মায়ের। স্কুলে পাঠানো, স্কুলে অভিভাবকের দায়িত্বসহ যেকোনো দায়িত্বই নানি পালন করতেন। আর্থিক অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ হলেও কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন তুলসীমালা।

তুলসীমালা এখন শুধু একটাই স্বপ্ন দেখেন, তার সন্তানেরা লেখাপড়া শিখে আত্মনির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিজের পরিচয় তৈরি করবে যে পরিচয় তুলসীমালার বর্তমান লজ্জাজনক পরিচয়কে ছাপিয়ে যাবে। তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে তুলসীরও কষ্টের দিন শেষ হবে, তাকে অভাব-অনটনে থাকতে হবে না। সমাজে তার এবং তার সন্তানদের পরিচয় নিয়ে কেউ উপহাস করবে না।

সেবা পাইনি, তাই বলে কি সেবা করব না

"আমি তারাশঙ্করের কবি উপন্যাস পড়েছি, এত সুন্দর একটি উপন্যাস, যেন আমারই জীবনের ছবি সেখানে দেখি, জীবন এত ছোট কেন?" - কথাগুলো বলতে বলতে শ্যামলীর [ছদ্মনাম] শ্যামল বরণ মুখে শ্রাবণে ঘনকালো মেঘের ছায়া নেমে আসে, মানবজীবনে কত পাওয়া-না পাওয়া থাকে, কিন্তু শ্যামলীর জীবনে যেন সব অপ্রাপ্তির বান; মুক্ত জীবন, সম্মান আর নিরাপত্তা কোনো – কিছুই তো পাওয়া হলো না।

শ্যামলী আবারো বলেন, "আমি কারো সেবা পাইনি, মায়ের সেবা পাইনি, আত্মীয়র সেবা পাইনি, সমাজের সেবা পাইনি, এমনকি যে দেশে আমার জন্ম, সেই দেশেরও সেবা পাইনি। কিন্তু আমি মাকে বলেছি, আমি মানুষের সেবা করতে চাই, আমি ডাক্তার হয়ে আমার জীবনের মতো অন্য সকল না পাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।" এই কথাগুলো বলার সময় তার চোখে বিদ্যুতের ছিল ঝিলিক।

শ্যামলীর মা পেশায় একজন যৌনকর্মী। তাই যৌন পেশার যে অপমান, যন্ত্রণা আর বেদনা শ্যামলীর মা চায়নি যে সেই অন্ধকার জীবনেও শ্যামলীও প্রবেশ করুক। এই জন্য তিনি শিশুকাল থেকে শ্যামলীকে তার গণ্ডির বাইরে রেখে বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আর দশটি সাধারণ শিশুর

মতোই তাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন, তবে সেটাও আড়ালে, সবার চোখের অন্তরালে, একাকী। ফলে মা হয়েও মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিতে পারেননি শ্যামলীর শৈশব-কৈশোর। আর সেই আক্ষেপই ঝরে শ্যামলীর কণ্ঠে।

শ্যামলী ২০ বছর বয়সী একজন তরুণী, পড়াশোনা করছে যশোরের কলেজে। অথচ এই ছোট্ট জীবনে তার না পাওয়ার ফর্দটা এক জীবনের থেকেও বড়, কী আছে সেই ফর্দে–

- কোথাও বাবার নাম বলতে পারিনি, কারণ আমার পরিচয় আমি একজন যৌনকর্মীর সন্তান
- আমি জানি না আমার বাবা কে
- আমার বাবাকে কখনো দেখি নাই
- বাবা বলে কাউকে ডাকতে পারি নাই
- সহপাঠীদের সাথে মিশতে পারি নাই
- শিক্ষকদের ভালোবাসা পাইনি
- বন্ধুদের সাথে মিশতে পারি নাই
- শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি
- কারো বাসায় যেতে পারিনি
- কাউকে বাসায় আনতে পারিনি
- কোনো সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি
- সবচেয়ে বড় কথা, কাউকে নিজের পরিচয় দিতে পারিনি

এত এত না পাওয়া, থেকেও না থাকার হাহাকার, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান শ্যামলীকে একটুও দমাতে পারেনি, নষ্ট হতে দেয়নি মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ, "আমার মায়ের পেশাটাকে একসময় ঘৃণা করতাম কিন্তু যখন জানতে পারলাম তার যৌনকর্মী হওয়ার ইতিহাস, এর পেছনের ভয়ানক গল্প, তখন থেকে আমি আর আমার মায়ের পেশাটাকে ঘৃণা করি না। বরং তার জন্য অনেক কষ্ট হয়। কষ্ট হয় তার এই মরে গিয়ে বেঁচে থাকা দেখে।" কথাগুলো বলল শ্যামলী। বলার সময় ওর চোখ ধক ধক করে জ্বলছিল।

এই সমাজের মানুষই শ্যামলীদের একঘরে করেছে। অথচ তার মা যখন একটি ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে, একটু আশ্রয় চেয়েছে, তখণ তো তাকে কেউ আশ্রয় দেয়নি। নিজের ভরণপোষণ চালানোর জন্য যখন সে একটি কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছে, তখন কোথায় ছিল এই সমাজ, কোথায় ছিল সমাজের পিতামাতারা, যারা আজকে আমার মাকে অচ্ছুৎ ঘোষণা করে? প্রশ্ন করে শ্যামলী। সমাজ যেমন আমাদের ঘৃণা করে, তেমনি আমরাও সমাজকে ঘৃণা করি – এই কথা বলে শ্যামলী তার ক্ষোভ উগরে দেয়।

শ্যামলী বলে, আমি জানি, মা জীবনে অনেক কষ্ট করে তার এই জীবনটা চালিয়ে নিচ্ছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে। জীবনে বহুবার প্রতারিত হয়ে মা বাধ্য হয়েছে এমন একটি পেশাকে বেছে নিতে। এই পেশাটির জন্য সমাজ তাকে অন্য চোখে দেখে, সমাজ তাকে মেনে নেয়নি, তার বিপদ-আপদ সব তার নিজের, সব তাকে নিজের হাতে মোকাবেলা করতে হয়। এই সমাজের কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

তবু আমার মা হেরে যায়নি জীবনের কাছে। মা আমাদেরকে লালন-পালন করছে, লেখাপড়া করাচ্ছে- যাতে আমরা তার মতো সমাজে অবহেলিত না হই, প্রতারিত না হই, পরাজিত হতে হতে যেন তার পেশাকেই বেছে না নেই। আমার মায়ের স্বপ্ন – আমি যেন সমাজের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

শ্যামলী দৃপ্ত কণ্ঠে বলে চলেন, আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার মাকে এই পেশা থেকে বের করে দূরে কোথাও নিয়ে যাবো, দূরে, বহুদূরে, হয়তো পাহাড়ের কোনো ঢালে, যেখানে মেঘ এসে ছুঁয়ে যাবে আমার মায়ের পা, বৃষ্টির অঝোর ধারা ধুয়ে দেবে আমার মায়ের সব গ্লানি, এক বিশুদ্ধ বাতাস এসে ভরিয়ে দেবে মায়ের প্রাণ। সেখানে থাকবে না কোনো ক্রূর দৃষ্টি, শুনতে হবে না কোনো কটুকথা, প্রকৃতির সন্তানকে প্রকৃতিই দিবে সম্মান, মর্যাদা।

আমি এখন কলেজে পড়ছি, আমার স্বপ্ন বড় হয়ে ডাক্তার হবো, মানুষের সেবা করবো। শ্যামলী বলে, "আমরা দরিদ্র বলেই জানি আমাদের কোনো মৌলিক চাহিদাই পূরণ হয় না। আমাদের কষ্টের কথা কেউ ভাবেনা। আমাদেরকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আর তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি নিজের পায়ে দাঁড়াতে। সমাজের মূলধারার মানুষের সাথে মিশে যেতে।"

আমি জানি, আমার মা, আমি বা আমার মতো অনেকেই কেবল যৌনকর্মী বা যৌনকর্মীর সন্তান হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছি। সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, মানুষ হিসেবেই আমাদের কেউ স্বীকার করতে চায় না। তাই আমি চাই, আমি যে বঞ্চনার ভিতর দিয়ে গেছি, অন্য কেউ যেন আর সেই কষ্ট ভোগ না করে। আমি সেবা পাইনি, তাই বলে কি সেবা করব না।

সূত্র: যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই গল্পগুলো লেখা

নাম: শিরিনা আক্তার
তারিখ: ১২/০৯/2022
শ্রেনি: অষ্টম

আমার নাম শিরিনা আক্তার। আমি জাহানাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়ি। আমার বড় হয়ে শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছা। আমার আম্মুও চাই আমি বড় হয়ে শিক্ষিকা হয়।

আমার নাম: সারিহা আমি বর হয়ে ডাক্তার হতে চাই। আমি প্রথম শ্রেনিতে পড়ি

তারিখ: ১২-০৯-2022
বার: সোমবার

আমার নাম: স্বান্তা আক্তার,
আমি ৭ম শ্রেনিতে পড়ি,
আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই, কারন, আমাদের চারপাশে কতো অসহায় লোক আছে, তারা টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারতেছে না। আর আমার মা যেভাবে নির্যাতন হয়েছে, এখন আমার মায়ের মতো অনেক মেয়েরা আছে যারা নির্যাতন হচ্ছে আমি তাদের ... যদি আর কোনো সমস্যা না হয় ... মুক্তিতে চিকিৎসা করাতে ... দাড়াতে

তারিখ: ১২/০৯/2022

নাম: তানজিলা ইসলাম
বাবা নাম: রাজু
মার নাম: রেহানা
আমি দেশের মানুষদের সাহায্য করতে চাই। আমার বাবা, ... আমি পুলিশ হতে চাই ...

১২/০৯/2022
রোজ: সোমবার

আমার নাম: ওমর ফারুক
শ্রেনি: ৬ষ্ঠ,

আমি বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হতে চাই। কারন আমি ছোট থেকে ভাবতাম মানুষ কিভাবে মেশিন যন্ত্রবাতি ... প্রকৃতি ইত্যাদি ...

যৌনকর্মী এবং তাদের সন্তানদের মানবাধিকার রক্ষায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর কর্মসূচি

কামরুজ্জাহান ফ্লোরা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের সকল ধরনের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করছে। সেই সাথে নারী ও মেয়েশিশু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, দলিত-হরিজন ও যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, অ্যাডভোকেসি, ক্যাম্পেইনসহ গবেষণার কাজ করছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কানাডার নতুন আন্তর্জাতিক নারীবাদী সহায়তা নীতিমালার অধীনে গৃহীত উইমেন'স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ - বাংলাদেশ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো স্থানীয় ও আঞ্চলিক নারী অধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ও কার্যকারিতাকে শক্তিশালী ও উন্নত করা। এখানে মূলত তিনটি প্রধান দিক বিবেচনা করা হয়: প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠান ও নারীবাদী মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠান ও জেন্ডার সমতা কর্মসূচি। তাই প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতায়িত করার জন্য আন্দোলন, নারী ও মেয়েশিশুর অধিকার সুরক্ষা এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সহায়তা করা এমজেএফের অন্যতম কাজ।

এমজেএফ জন্মলগ্ন থেকেই যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সাথে যুক্ত এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে আসছে।

উদাহরণস্বরূপ

- যৌনপল্লি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি উচ্ছেদ বন্ধে রিট পিটিশন দায়েরের সাথে যুক্ত থাকা
- সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ককে একটি সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা
- যৌনকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের মেডিকো লিগ্যাল সহযোগিতা করা
- যৌনকর্মীদের স্কুলপড়ুয়া শিশুদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা

এর পাশাপাশি এমজেএফ উইমেন্স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ-বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সাল থেকে যৌনকর্মী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে কাজ করছে এমন দুটি সংগঠন সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক ও মুক্তি মহিলা সমিতির সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে কাজ করছে, যার আওতায় সংগঠন দুটির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা, কর্মসূচি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা দিয়ে আসছে। এছাড়া সংগঠন পরিচালনায় নারীবাদী কর্মসূচি প্রণয়ন ও উন্নয়ন, নারীবাদী নেতৃত্ব এবং নারীবাদী অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্প সহায়তা প্রদান করছে।

ঢাকায় অবস্থিত সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক এবং রাজবাড়ীতে কর্মরত মুক্তি মহিলা সমিতি যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উইমেন'স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ - বাংলাদেশ প্রকল্প দ্বারা উক্ত সংগঠন দুটির প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ হলো:

- জেন্ডার সাম্যতার আলোকে এবং যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে
- জেন্ডার সাম্যতার প্রেক্ষাপটে সংগঠনের বিভিন্ন পলিসি তৈরি হয়েছে
- সংগঠনের সক্ষমতা মূল্যায়ন করে অ্যাকশন প্ল্যান করা হয়েছে
- পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে
- সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে
- বোর্ড মেম্বারগণকে সংগঠন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং রূপান্তরকামী নেতৃত্ব বিকাশের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- চাহিদা মোতাবেক বিকল্প কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে উপকারভোগী যৌনকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে
- অসচ্ছল যৌনকর্মীদের সন্তানদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে
- যৌনপল্লিভিত্তিক যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য ও আইনসংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে
- যৌনকর্মীদের সন্তানদের জীবন দক্ষতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

- যৌনকর্মীদের সন্তানদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দুটো সংগঠন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ এবং সরকারের সাথে লবিং ও অ্যাডভোকেসি করে যাচ্ছে এবং এর ফলাফল হিসেবে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে লাভবান হয়েছে, যেমন:

- ২০ জন যৌনকর্মীর সন্তানকে সরকারিভাবে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে
- করোনার সময়ে যৌনপল্লির ১৩০০ যৌনকর্মীকে সরকারিভাবে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে
- সরকারি বিভিন্ন সেবা (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী) কার্যক্রমে যৌনকর্মীদের যুক্ত করা হচ্ছে।
- উইমেন'স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ- বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন যৌনকর্মীকে বিকল্প আয়ের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণসহ ব্যবসা শুরু করার জন্য ক্ষুদ্র আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং ২০ জন কিশোরীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালে যখন করোনা সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে, তখন যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানেরা দুর্ভোগের মুখে পড়েন। তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, ফলে খাদ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাদের যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়, তা কাটাতে কোভিডের সময়ে এমএজেএফ ডাব্লুভিএল-বি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও খাদ্যসেবা প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ৩৩৫ জন যৌনকর্মীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

আমাদের দেশে যৌনকর্মী এবং তাদের সন্তানেরা এক পরিচয়বিহীন জীবন যাপন করেন। প্রতিনিয়ত অমর্যাদা, অসম্মান, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সমাজে তারা থেকেও যেন নেই, নেই তাদের অস্তিত্ব, তারা যেন এক নিষিদ্ধ নগরের বাসিন্দা। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন মনে করে যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলোকেই মাথা উঁচু করে মর্যাদার সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে হবে। আর তাই এমজেএফ এই প্রান্তিক সংগঠনগুলোকে তহবিল প্রদানসহ সকল ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করছে।

সব কটা জানালা খুলে দাও না...

এ সমাজে যৌনকর্ম বা যৌনকর্মীকে খুব খারাপ চোখে দেখা হয়। এটি জীবিকা নির্বাহের সবচেয়ে ঘৃণিত উপায়। যদিও সমাজের বিভিন্ন স্তরের অগণিত মানুষ তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যৌনকর্মীদের কাছে নিয়মিতভাবে যাচ্ছে। তারা যায় বলেই তো অনাদিকাল থেকে টিকে আছে এই পেশা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যে মানুষগুলো এখানে যাচ্ছে, এদের ব্যবহার করছে, টাকা ঢালছে, সেই মানুষগুলোর প্রতি কেউ আঙুল তুলে কিছু বলছে না। তারা সমাজের প্রতি ঘৃণিত বা নিন্দিত নয়। নিন্দিত বা ঘৃণিত হয় তারা, যাদের কাছে সমাজের এই মানুষগুলো লুকিয়ে, আড়ালে-আবডালে যায়। বাহ্, কী চমৎকার বিধান এই সমাজের।

দেশের আইন অনুযায়ী সব শিশুর পাশাপাশি যৌনকর্মীদের সন্তানদের যত্ন, সহায়তা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে। যৌনপল্লিতে থাকা অসংখ্য শিশুর জন্য এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও একটি বিকল্প পরিবেশ দরকার। তাদের মধ্যে অল্প কিছুসংখ্যক শিশু এনজিওর সেফ হোমের সুবিধা পায়। তবে সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে, এরা কেউই আর যাবে না ফিরে যৌনপল্লিতে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একটি বিকল্প পরিবেশে যত্ন, সহায়তা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা জুগিয়ে যৌনকর্মীদের সন্তানদের উন্নয়নে সহায়তা করা দাতা সংস্থা, সরকার বা দানশীল ব্যক্তিদের জন্য একটি যথাযথ উদ্যোগ। এই বিকল্প সহযোগিতা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রয়োজনে আরও বেশি সময় যাবৎ বাস্তবায়ন করলে যৌনকর্মীদের সন্তানের মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শুধু সরকার বা এনজিও নয়, এদের সামনে আলোর প্রদীপ জ্বালানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে সমাজের বিত্তশালী ও সাধারণ মানুষদের। সবাই মিলে চেষ্টা করলে আমরা পারব এই শিশুদের বাঁচাতে। এই যে জন্মের সাথে সাথে পাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকার, যেটা কিনা যৌনপল্লিতে জন্ম নেওয়া কোনো শিশুই আশা করে না, তা থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে, তৈরি করতে হবে একটি অনুকূল পরিবেশ ও ব্যবস্থা। প্রত্যেক শিশুই অসীম সম্ভাবনাময়, খুলে দিতে হবে তাদের সম্ভাবনার দুয়ার, খুলে দিতে হবে ভবিষ্যতের জানালা, সেই খোলা জানালা দিয়ে আলো আসবে, মেঘ আসবে, তারা পাখি হয়ে উড়ে যাবে ডানা মেলে।

ভলো দিনের প্রত্যাশা

যে দেশের জন্ম সংগ্রাম, লড়াই আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যে দেশে ন্যায্যতার ভিত্তিতে, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের সংবিধান রচিত হয়েছে, সেখানে একজন যৌনকর্মীর সন্তান, যৌনপল্লিতে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা একটি কন্যাশিশু কোথায় যাবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারব না, এ হতে পারে না। উত্তর আছে আইনে, বিধিমালায়, নীতিমালায়, আন্তর্জাতিক আইনের পাতায় পাতায়, আমাদের চিন্তায়, চেতনায় ও সংস্কৃতিতে। একজন মানুষ হিসেবে যখন জন্ম নিয়েছে যে শিশু তাকে দিতে হবে তার অধিকার। তাকে দিতে হবে জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, মানবিক মর্যাদা। রাষ্ট্রের ও সমাজের সন্তান হিসেবে সে থাকবে সমাজেই, বেড়ে উঠবে সম্মানের সাথে, স্বপ্ন নিয়ে। একজন মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে উপভোগ করবে সকল অধিকার, সমান অধিকার। আর এই দায়িত্ব আমাদের সকলের...।